মাতৃমনন

# শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবসাধনা ও শ্রীশ্রীমা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছে। যে-যে-কারণগুলির জন্য তাঁর আবির্ভাবের স্বাতন্ত্র্য তার মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান কারণ, অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে শ্রীভগবান নারীশক্তি, বিশেষত মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা করে গেলেন। আজকের বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নের নতুন নতুন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছে এবং রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে এই সংক্রান্ত প্রায়োগিক কাজও হচ্ছে কিছু কিছু। এই জাতীয় আয়োজনগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই সামাজিক-অর্থনৈতিক-জীববিদ্যাগত ভিত্তিগুলির উপর নির্মিত। আমাদের জাতীয় বা বৈশ্বিক জীবনযাপন ও সামাজিক ব্যবস্থায় এইসব ভিত্তিগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর বাইরেও মাতৃশক্তির ক্ষমতায়নের জন্য অন্য মাত্রা থাকতে পারে কি না তা নিয়ে একালের চিন্তকদের খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায় না। ভারতীয় শাস্ত্রে কিন্তু নারীরূপ ও মাতৃরূপের প্রতিষ্ঠায় এক অন্য মাত্রার ক্ষমতায়নের বা সশক্তীকরণের দিশা দেখানো আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার সাধনা সেই অন্য দিঙ্‌নির্দেশের উদাহরণ।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবন ও কথা অনুধ্যান করলে আমরা তাই সহজেই বুঝতে পারি যে, এই জীবনটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের রচিত প্রণামমন্ত্রে (যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ ইত্যাদি) এই তত্ত্বটিকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। অবতার যখন আসেন, তিনি এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি নিয়েই আসেন যে, তিনি এই জগতে ধর্ম সংস্থাপন করবেন, অধর্ম দূর করবেন। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, এই ধর্ম ও অধর্মের ধারণা দুটি যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। বিশেষত আমরা যখন কালান্তরে ধর্ম-অধর্মের ধারণার ভিত্তিতে অবতারজীবনকে অনুধ্যানের চেষ্টা করি। ভগবান রামচন্দ্রের জীবনে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বা অন্য অন্য অবতারদের জীবনে অসুর বিনাশরূপ নানান কাজ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ নির্দিষ্ট করে বলেছেন, এবারে শ্রীরামকৃষ্ণও একটি অসুর বিনাশ করেছেন, সেই অসুরটির নাম ‘সংশয়’। প্রাথমিকভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় না, সেই অসুরের চরিত্রটি, পূর্ব পূর্ব অবতারদের নিধন করা অসুরদের থেকে আলাদা। প্রথমেই আলাদা এইখানে যে, সংশয় নামক অসুরটি

বাইরে নয়, মানুষের অন্তরে বিরাজ করছে। লক্ষণীয়, যে-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা আবির্ভূত হয়েছেন সেই যুগে এই অসুরটি ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠছিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন এবং শ্রীমা সারদাও একথায় সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন বা পুনরুক্তি করেছেন যে, জগতে মাতৃভাব প্রচারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আসা। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'সংশয়'-রাক্ষস নিধন ও মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা—এ-দুটির মধ্যে কি কোনও বিরোধ আছে? যদি বিরোধ না-ই থেকে থাকে তাহলে এ-দুটির মধ্যে সম্পর্কই বা কোথায়? এই দুটো কি কোনও সমান্তরাল আলাদা কাজ, নাকি এদের মধ্যে কোনও ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে?

আধুনিক কালের সমাজবিজ্ঞানীরা সংশয় (ইংরেজি doubt বা suspicion) নিয়ে আলোচনার সময় বলেন, এই 'সংশয়' বা 'সন্দেহে'র কয়েকটি অভিমুখ বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমত, যেকোনও ক্ষেত্রেই সংশয় বিভেদ ও বিবাদ তৈরি করে। একদল মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে—কিন্তু যখনই তাদের মনের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধে সংশয় দানা বাঁধবে, তখনই শুরু হবে বিবাদ এবং পরিণামে একসঙ্গে কাজ করা মানুষগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। স্বামীজী ভারতীয়দের সমালোচনা করে বলেছিলেন, ভারতীয়রা পাঁচ মিনিটও একসঙ্গে একটা কাজ করতে পারে না। তার কারণ হল এই সন্দেহাতুরতা। এটি সন্দিগ্ধ মনের একটি পরিণাম।

দ্বিতীয়ত, সংশয় যার মধ্যে জন্মায়, তার মধ্যে একটি নেতিবাচকতা তৈরি হয়। নেতিবাচকতার অর্থ, জগতের সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকেই সন্দেহাতুর মন, কিছুটা খারাপভাবে বা কিছুটা ঘৃণার চোখে বা কিছুটা হতাশার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। এর ফলে সবকিছুতেই একটা আস্থাহীনতা, একটা বিশ্বাসহীনতার ভাব চলে আসে।

তৃতীয়ত, সংশয় যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে তাহলে ব্যক্তিমানুষ, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রজীবন আস্তে আস্তে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সংসারে প্রত্যেক মানুষ একটা আশ্রয় চায়, যে-আশ্রয়ে আত্মীয়-পরিচিত-পরিজন-অন্যজনের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা যাবে, একরকম কিছু ভাবা যাবে। প্রতিটি মানুষ কোনও ব্যক্তিজীবনে, কোনও সংগঠন-জীবনে, কোনও ঈশ্বরভক্তির মধ্যে, কোনও মহাপুরুষের জীবনে—ইত্যাদি এক বা একাধিক ক্ষেত্রে আশ্রয় চায় যেখানে মানুষের দুর্বিষহতার নিরসন ঘটবে। সংকটের মধ্যে, বিপন্নতার মধ্যে একটা স্থিরতার লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। জীবনের কাজকর্মগুলিকে অর্থহীন মনে হবে না—যেমন মনে হয়েছিল সিসিফাসের। কিন্তু মানুষের মধ্যে সংশয়গুলো বাড়তে থাকলে এইসব আশ্রয় আস্তে আস্তে সরে যায়। এর অনিবার্য ফল হল একধরনের বিক্ষিপ্ত জীবনযাপন। এই আশ্রয়হীনতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, পরিবারের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে বা এমনকী সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

## দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্ব থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অসামান্য অগ্রগতি ঘটেছে সারা পৃথিবীতে। সমাজবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মানবমনীষার বিস্ময়কর বিকাশ এই সময়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অথচ এই সময়ের মধ্যেও পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে। এছাড়া জাতি-সংঘর্ষ, আন্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষ ও অন্তঃরাষ্ট্র সংঘর্ষ ঘটেছে প্রচুর পরিমাণে। সামাজিক জীবনে কল্যাণকর অভিজ্ঞান যেমন চিহ্নিত হয়েছে তেমনই পাল্লা দিয়ে অকল্যাণের ছবিগুলিও বাড়ছে। মানুষের লাভ-ঠিকরানো লোভ আর নিয়ন্ত্রণ-করতে-না-চাওয়া

ভোগ-চাহিদা পরিবেশকে, প্রকৃতিকে প্রতি মুহূর্তে আগ্রাসী আক্রমণে বিপন্ন করেই চলেছে। এর বিপক্ষে সচেতন মানুষের ইতিবাচক আন্দোলন অবশ্যই আছে, কিন্তু তাতে আজ পর্যন্ত আসন্ন বিপদের মাত্রা কমেনি। আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়ার পথে যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কের উজ্জ্বল মুখের উপরে সংশয়ের মুখোশ এসে পড়ছে বারবার। তাই যেকোনও ইতিবাচক সংযমের দাবির সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে সন্দেহ নামক অপর ব্যক্তিত্বের ছায়া। ভাবছি, এই সংযম আমাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে, স্বেচ্ছামুখী জীবনযাপনকে থমকে দেওয়ার চেষ্টা নয় তো! যেন সামাজিক নিয়মনীতি মানার মধ্যে এক ধরনের অকাম্য মধ্যযুগীয়তা এসে যাচ্ছে এই সন্দেহে আধুনিকতার বা অতি-আধুনিকতার ঈশ্বরতুল্য অভিমানটাকে আঁকড়ে বাঁচতে চাইছি আমরা। তার ফল সারা পৃথিবী দেখছে শেষ প্রায় দেড় শতক ধরে।

এই কালের প্রথম প্রভাতে এসেছিলেন অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তি শ্রীমা সারদা দেবী। তাঁরা জানতেন সেযুগের ও অনাগতের সমস্যাটা কোথায় এবং এই সমস্যার সমাধানই কোথায়। সেই মুক্তির পথ নির্ধারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা করেছেন তার মধ্যে প্রথম কাজটিই হল শ্রীশ্রীমা সারদাকে জগতের সামনে প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ এই যে জগদ্‌ব্যাপী চৈতন্যশক্তি বিরাজমান, একটি মাতৃমূর্তিতে তাকে জগতের সামনে উপস্থিত করা। এইরকম করার কারণ, এবারে অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের লক্ষ্য 'সংশয়' নামক রাক্ষসনিধন। সেই উদ্দেশ্যে এবারে তিনি তীর-ধনুক বা সুদর্শনচক্র নিয়ে এলেন না, এলেন একটি মাতৃমূর্তিকে নিয়ে। এই মাতৃমূর্তি জগতের সামনে থাকলে জগতের মধ্যে রাজত্বকারী এই সংশয় নামক অসুর আপনা থেকেই পরাজয় স্বীকার করবে। এই যুদ্ধ-পরাজয়ে কোনও রক্তপাত ঘটবে না, কোনও প্রাণহানি ঘটবে না; কেবল আস্তে আস্তে ভেতর থেকে সংশয়ী মানুষটি পালটে যাবে, সংশয়ী মানুষের চরিত্র পালটে যাবে।

এবার প্রশ্ন, এই যে মাতৃভাব শ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে এলেন, এই মাতৃভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি কী, যেগুলি থাকলে সংশয়রূপ রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব হবে, যুদ্ধে জেতা সম্ভব হবে? এই মাতৃশক্তির একটা খুব স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, ইনি জগদ্‌ব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির ধারিণী। এই মাতৃশক্তি সংসারের সাধারণ জননীশক্তির মতো দেখতে হলেও সম্পূর্ণত তা নন। এই শক্তি আসলে স্বরূপত একটি জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক শক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে দু-রকমের মায়াশক্তির কথা বলা হয়েছে—একটিকে সাধারণভাবে বলা হয়েছে মায়াশক্তি বা জীবমায়া, আর একটিকে যোগমায়া। শ্রীজীব গোস্বামী এই মায়াশক্তির তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন মূলত ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে। তিনি পরবর্তী কালে 'সর্ব্বসম্বাদিনী'তেও এর উল্লেখ করেছেন। সনাতন গোস্বামীর লেখাতেও কিছুটা এই শক্তির উল্লেখ আছে। জীবমায়া ও যোগমায়ার মধ্যে পার্থক্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জীবমায়া হল 'বিমুখমোহনম্'। অর্থাৎ মায়াশক্তির দ্বারা ভগবানের থেকে বিমুখ হয়ে যায় মানুষ। সাধারণ মায়াশক্তি আমাদেরকে ভগবানের থেকে বিমুখ করে জগতের অন্য সমস্ত কিছুতে মুগ্ধ করে, আসক্ত করে, লিপ্ত করে। ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেওয়াই সাধারণ মায়াশক্তির কাজ। অথচ যোগমায়া কিন্তু 'প্রমুখমোহনম্' অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রমুখ করে, আকৃষ্ট করে। লক্ষণীয়, যোগমায়া মুগ্ধ করে বটে কিন্তু ভগবানের প্রতি মুগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রকটলীলা অবসানের পরে, একটি বিশেষ মুহূর্তে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়ে রাধুকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এইটি যোগমায়া, একে আশ্রয় করে থাকতে। অর্থাৎ যোগমায়ারূপ যে-মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়ে গেলেন তাকে আশ্রয় করে মা

সারদা এই জগতে থাকবেন এবং কাজ করবেন। সুতরাং যোগমায়ার যে-প্রমুখমোহন শক্তি অর্থাৎ ভগবানের প্রতি মুগ্ধ করানোর শক্তি, সেই শক্তিকে মা আশ্রয় করবেন। তাই দেখা যাচ্ছে মায়ের জীবনের প্রতিটি আচরণই আসলে ভগবৎ-প্রমুখ। স্বরূপত তিনি অবতারশক্তি, ভগবৎসত্তা ছাড়া তাঁর কোনও অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যখন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করছেন তখন দেখা যাচ্ছে, ওই যোগমায়াকে আশ্রয় করে 'প্রমুখমোহন' বা ভগবৎসত্তায় জগতকে আকৃষ্ট করার জন্যই মেলামেশা করছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীমা যে-মাতৃমূর্তি ধরে এলেন বা শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের মধ্য দিয়ে যে-মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা করছেন তা স্বরূপত একটি আধ্যাত্মিক শক্তি এবং আচরণে তা জগতকে আসলে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করছে। এখানেই এই মাতৃমূর্তির বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই সংসারের আর পাঁচটি জননীমূর্তির চেয়ে তা আলাদা।

দ্বিতীয়ত, এই মাতৃমূর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য জননীর স্নেহ, করুণা, ভালবাসা। 'জননী', 'মা' এই শব্দগুলি বললেই উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। শ্রীশ্রীমার জীবনেও এগুলি স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোনও আশ্চর্য হওয়ার জায়গা নেই।

তৃতীয়ত, এটি একটি ধাত্রীশক্তি, ধারণকারিণী শক্তি। এই শক্তির বৈশিষ্ট্য, এটি যাবতীয় বিক্ষিপ্ততা-বিভেদ-বিবাদ-কলরোলের মধ্যেও একটি জায়গায় সবাইকে যেন একত্র করতে পারে, একটা জায়গায় সবাইকে যেন বেঁধে রাখতে পারে।

সারদা দেবীর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তির এই তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। এর বাইরেও বহু বৈশিষ্ট্য আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। তার কারণ অবতারশক্তি যখন আবির্ভূত হন তখন জগৎ জুড়ে তাঁর নানান রূপ প্রকাশ পায়! আমরা কেবল উক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে মাকে দেখবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই আলোচ্য, শ্রীশ্রীমা জগদ্ব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তির জমাটবাঁধা একটি রূপ—স্বরূপেও বটে, আচরণেও বটে। অর্থাৎ জ্ঞানের দিক থেকেও বটে, ক্রিয়ার দিক থেকেও বটে। দক্ষিণেশ্বরের একটি বিখ্যাত ঘটনা। ঠাকুরের প্রশ্ন ছিল, মা তাঁকে কোন পথে নিয়ে যেতে এসেছেন? মা উত্তর দিয়েছিলেন, ঠাকুরকে তিনি ধর্মপথে সাহায্য করতে এসেছেন। আর একদিন মা-ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন। মা জানতে চেয়েছিলেন, ঠাকুর মাকে কীভাবে দেখেন? তার উত্তরে ঠাকুর যে-উক্তিটি করেছিলেন সেখানে তিনটি নারীরূপের কথা বলা ছিল; একটি মন্দিরের ভবতারিণী, একটি ঠাকুরের জননী এবং তৃতীয়টি ওই সময়ে পদসংবাহনরতা শ্রীশ্রীমার। ঠাকুর খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ওই তিনটি রূপই তাঁর কাছে অভিন্ন। জগৎ ব্যাপ্ত করে রয়েছে যে-চৈতন্যশক্তি, তারই ত্রিধা-বিকাশ তাঁর কাছে ওই তিনটি রূপ। শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ পত্নীরূপে গ্রহণ করেননি, সাধারণ নারীরূপে দেখেননি, সাধারণ জননীরূপেও নয়। এই যে জগদ্ব্যাপিনী চৈতন্যশক্তি, যিনি সৃষ্টি করছেন জগতের বিভিন্ন জননীশক্তির মধ্য দিয়ে, তিনিই আসলে শ্রীশ্রীমারূপে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। এই কারণেই ষোড়শী ত্রিপুরসুন্দরীর আরাধনা করে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে এই শক্তিটিকে তিনি জাগ্রত করেছিলেন এবং এই চৈতন্যশক্তিকেই মায়ের মধ্যে জাগ্রত করে জগতের জন্য রেখে গিয়েছেন।

জগৎ জুড়ে জড়ের লীলা। বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবির্ভাব ও চর্চার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত জড়কে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সেইসব জড়বাদী গবেষণা বা আলোচনা দেখলে মনে হয় যেন জগতে চৈতন্যের প্রকাশ নেই। যাঁরা ঈশ্বর মানেন না, মনে করেন এই জীবনটাই যথেষ্ট, এই জীবনের

বাইরে কোনও জীবন নেই, তাঁরা এই কারণেই জড়বাদী যে, এই জড়জগতের বাইরে তাঁরা অন্যকিছু দেখতে পান না। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে যখন জগদ্‌ব্যাপিনী চৈতন্যশক্তির ঘনীভূত মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন, পূজা করলেন, তখন তিনি যেন জড়জগতের সামনে একটি 'চ্যালেঞ্জ'-কে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তাই মায়ের জীবন-বাণী-আচরণ নিয়ে যখনই পড়াশোনা-আলোচনা-গবেষণা হবে তখনই অবাক হয়ে দেখতে হবে এই জড়জগতটাই শেষ কথা নয়। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতা নন এরকম একজন গ্রাম্যবালা, আধুনিক জীবনের অনেক কিছুর প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা একজন নারী, তাঁর জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে তুলে ধরছেন একটি অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশকে।

মায়ের জীবনের একটি ঘটনা এখানে স্মরণীয়। মায়ের কাছে বিচিত্র ধরনের মানুষেরা আসত। একবার জনৈক দীক্ষিত ভক্ত, মন্ত্র জপ করে শান্তি না পেয়ে মনে খেদ নিয়ে এসেছে। মাকে মন্ত্র ফেরত দিতে চাইছে। মা নিষেধ করলেও সে নাছোড়। তখন মা বলছেন, ''আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।'' যখন এই কথাটি বললেন তখন ভক্তটির চৈতন্য হল। এতদিন মায়ের দেওয়া সিদ্ধ গুরুমন্ত্রটি তার কাছে ছিল। সে বিপদে আপদে সেটি স্মরণ করলে রক্ষাকবচরূপে সেটিকে কাছে পেত। কিন্তু মা যখন বললেন মন্ত্র তিনি ফেরত নিলেন, তখন ভক্তটির মনে আতঙ্ক জাগল। সে বলে উঠল, ''তবে কি, মা, আমি রসাতলে গেলুম?'' সঙ্গে সঙ্গে মা অভয় দিয়ে বললেন, ''কী, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যারা এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।'' কী অসাধারণ একটি উক্তি! মা সাধারণ গুরু তো নন। অবতারশক্তিরূপে আর্ত, বিপন্ন ও প্রপন্ন ভক্তের কাছে এই আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তিনি সেই আধ্যাত্মিক শক্তির মূর্ত বিগ্রহ, যে-শক্তি জগতের সমস্ত দেবশক্তির ঊর্ধ্বে বিরাজমান। কেনোপনিষদে একটি বিখ্যাত গল্প আছে। যখন দেবতারা অহংকার-বশে ভাবলেন তাঁদের শক্তি প্রচুর এবং সেই শক্তিই জগতের সর্বোত্তম শক্তি, তখন পরব্রহ্ম একটি অপূর্ব পূজ্য মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা ওই শক্তির সম্মুখে নিজেদের শক্তি দেখাতে গিয়ে পরাজিত হলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'' (৩।২৭)—অহংকারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি মনে করে যে 'আমিই কর্তা'—অর্থাৎ আমি সবকিছু করছি। ওই পূজ্য মূর্তি আসলে সেই চৈতন্যশক্তি যিনি সকলকে শক্তি দান করেন। তিনি দেবতাদের ভেতর থেকে শক্তি সরিয়ে নিলে দেবতারাও শক্তিহীন হয়ে যান। উপনিষদ বলছেন, আকাশে আবির্ভূত হৈমবতী উমা দেবতাদের বলে দিলেন—''ইনি ব্রহ্ম, যাঁর শক্তিতে তোমাদের মহিমা।'' জগতে যত শক্তি রয়েছে তার উপরে বিরাজিত এই চৈতন্যশক্তি; তাঁকে মাতৃমূর্তি বা নারীমূর্তিতে কল্পনা করা হয়। তাই শ্রীমা সারদা ভক্তদের বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত কিছু করছেন এবং অন্য কারও সামর্থ্য নেই তাঁর সন্তানদের একটুও ক্ষতি করতে পারে। জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক শক্তি জগতের সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলছেন, বিশ্বাসহীনতা,

আশ্রয়হীনতার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সেই আশ্রয় যাঁকে নিয়ে এই জগৎ বিপন্নতার মধ্যে প্রপন্নতা লাভ করতে পারে। শ্রীশ্রীমা আসলে কে, একথা শিবুদাদা মাকে বারবার জোর করে জিজ্ঞাসা করাতে মা স্বীকার করেছিলেন, তিনিই কালী। জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি কত রূপ তাঁর, তা তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জানিয়ে দিয়েছেন। এই সবকিছুই প্রমাণ করে যে, এই চৈতন্যরূপিণী শক্তির জমাটবাঁধা আবির্ভাব শ্রীশ্রীমা।

শ্রীশ্রীমায়ের দ্বিতীয় আর একটি রূপ স্নেহ, করুণা, ভালবাসা। সংসারের সমস্ত মায়ের মধ্যেও এই স্নেহ-মায়া-ভালবাসাই রয়েছে। অতএব মনে হতে পারে জগতের সাধারণ মায়েদের আর মা সারদার ভালবাসা তো একই! উত্তরে বলা যায়, কিছুটা এক, কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্যই সংসারের দুর্লভ সম্পদ মায়ের ভালবাসা-করুণা। ''সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার/ অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার''—একথা নিঃসন্দেহে সত্য, তৎসত্ত্বেও শ্রীশ্রীমার ভালবাসা-করুণা সংসারের অন্যান্য জননীর থেকে আলাদা। বিশুদ্ধানন্দজী মাকে বলেছিলেন 'গণ্ডিভাঙা মা', বিরজানন্দজী বলেছিলেন 'জন্মজন্মান্তরের মা'। মায়ের ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে জয়রামবাটীতে এসে সবাই মায়ের কাছে থেকে শান্তিলাভ করে যেতেন। মায়ের ভালবাসা আলাদা এই কারণে যে, সেই ভালবাসা বিস্তৃত হয়েছে সবার ওপরে। কাউকে সে-ভালবাসা বাদ রাখেনি, কোনও বাছবিচার করেনি। সংসারে জননীর ভালবাসা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু তা কেবলমাত্র নিজের সন্তানকে কেন্দ্র করে। নিজের সন্তান ব্যতিরেকে সকলের প্রতি, জগতের প্রতি এই ভালবাসা সাধারণ মায়েদের থাকে না। কিন্তু শ্রীমার বৈশিষ্ট্য এই, সে-ভালবাসা জগতের সবার প্রতি বিস্তৃত। মা সে-কারণেই বলেছিলেন, শরৎ তাঁর যেমন ছেলে আমজাদও তেমনই ছেলে। একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন সম্পাদক; আর একজন ডাকাত। তবু শরৎ মহারাজের সঙ্গে একজন ডাকাতকে তুলনা করে মা বললেন, দুজনেই সমান তাঁর কাছে। আসলে মায়ের মাতৃত্বে সেই বিশিষ্ট ভালবাসা বর্তমান যার ভিত্তিতে এরকম সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দুটি মানুষ তাঁর কাছে সমান।

শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও মায়ের ভালবাসা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ির বাছুরটি ডাকছে, কেউ শান্ত করতে পারছে না। মা যাচ্ছেন, বাছুরকে আদর করছেন, সে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী নয়, গৃহী ভক্ত নয়, ডাকাত নয়—একটি মনুষ্যেতর জীবও তাঁর কাছে এমনভাবে আশ্রয় পাচ্ছে। সেই বেড়ালের ঘটনাটিও অতি পরিচিত, যে মায়ের পায়ের কাছে সবসময় ঘুরত, মাকে অসুবিধায় ফেলত নিত্য কাজকর্মে। মা মাঝে মাঝে লাঠি তুলতেন তাকে মারার জন্য। বেড়ালও জানত মা লাঠি তুললে একজনই বাঁচাতে পারেন, সে মা নিজে। সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের পায়ের কাছে এসে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকত। মা আর মারতে পারতেন না। যারা সেসময় আশেপাশে থাকত তারাও বলত, মায়ের দ্বারা তাকে আর মারা হবে না, কারণ ও চরণে আশ্রয় নিয়েছে। মা যখন জয়রামবাটী থেকে চলে আসছেন তখন বেড়ালটির দুরবস্থা কী হবে তা বুঝতে পারছেন! কারণ মা থাকাকালীনই জ্ঞান মহারাজ মাঝে মাঝে বেড়ালটিকে শাস্তি দিতেন। তাই মা জ্ঞান মহারাজকে বললেন তাকে দেখার জন্য, খেতে দেওয়ার জন্য। মা বুঝেছিলেন, শুধুমাত্র এতে বিড়ালের ভাগ্য ফিরবে না। তাই সঙ্গে একটি অসাধারণ কথা যুক্ত করে দিয়ে বললেন, ''ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।'' এই মাতৃত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত মানুষের ভেতরে, জীবজন্তুর

ভেতরে সর্বত্র নিজের সন্তানকে দেখছেন মা, তাদের মধ্যে চৈতন্যশক্তিকে বিরাজিত দেখছেন, তাই একাত্ম হয়ে ভালবাসছেন। সাধারণ মানুষ ভালবাসে। কিন্তু ভালবাসার পাত্রের থেকে নিজে আলাদা থাকে, তাই ভালবেসে প্রতিদানে কিছু চায়। মায়ের ভালবাসায় এই প্রতিদানের প্রশ্নই নেই। কারণ তিনি ঐকাত্ম্য অনুভূতিতে ভালবাসছেন। তিনি তাদের মধ্যে বিরাজিত থেকে ভালবাসছেন। সুতরাং তাদের কাছ থেকে ফিরে চাওয়ার কোনও আকাঙ্ক্ষাই মায়ের নেই। মাতাল পদ্মবিনোদ বাগবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতেন, মা তাঁকে জানলা খুলে দেখতেন। পদ্মবিনোদও জানতেন মা তাঁকে জানলা খুলে দেখবেন এবং ওই দর্শনেই তিনি উদ্ধার হয়ে যাবেন। এটিই মায়ের মাতৃস্নেহের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, তিনি আবির্ভূত হয়ে সন্তানের চরিত্র বদলে দিচ্ছেন। সেই কারণেই জগতের সাধারণ জননীর থেকে তিনি আলাদা।

মাতৃমূর্তির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তিনি সবকিছুকে একসঙ্গে ধরে রাখতে পারেন, বেঁধে রাখতে পারেন। এটি অপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটলীলা অবসানের পর যখন পার্ষদ-পরিকরেরা সবাই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ছেন, মঠ স্থাপিত হলেও সকলে মঠবাসী হচ্ছেন না, তখন শ্রীশ্রীমা ছিলেন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কাছে আশ্রয়স্বরূপ। শুধু তাই নয়, যখনই রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় কোনও সমস্যা বা সংকট বা সংশয় তৈরি হয়েছে যা সঙ্ঘের একত্রিত সদস্যদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে দিতে পারত, মায়ের সিদ্ধান্ত সেগুলিকে মিটিয়ে দিয়েছে। গৃহী ভক্তদের অনেকেই মনে করেছিলেন স্বামীজীর প্রচারিত সেবাধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমোদিত নয়। এমনকী সন্ন্যাসী শিষ্যদের কারও কারও মধ্যেও এমন সন্দেহ স্থান পেয়েছিল। কাশী সেবাশ্রমের সাধারণ মানুষদের জন্য নিবেদিত কর্মধারা দেখে মা মন্তব্য করেছিলেন, ঠাকুর স্বয়ং সেখানে বিরাজ করছেন। কথাটি রাজা মহারাজ শুনে কথামৃতকার শ্রীম-র কাছে বলতে পাঠান। শ্রীম একথা শুনে আর কোনও দ্বিরুক্তি করেননি। মায়ের ওই সিদ্ধান্তবাক্য সমস্ত সংশয়কে নাশ করে দিল। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের প্রথমদিকের ব্যাখ্যাতা, তাঁর যদি ওই সংশয় থাকত, তিনি যদি ওই সংশয় প্রচার করতেন, তাহলে রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের মধ্যে সংকট তৈরি হতে পারত। স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর এরকম আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। স্বামীজী স্থির করেছিলেন মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের উদ্দেশ্য হবে অদ্বৈত সাধনা—সেখানে কোনও পুজো, প্রার্থনা হবে না। কিন্তু একবার তিনি আশ্রমে গিয়ে দেখলেন তাঁরই শিষ্যরা সেখানে একটি ঠাকুরঘর করে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করছেন। স্বামীজী বিরক্ত হলেন এবং বিরক্তিটা প্রকাশ করলেন। পুজো সাময়িকভাবে বন্ধ হল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই, স্বামীজীর শিষ্যরা স্বামীজীর এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণত মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর অদ্বৈত আশ্রম থেকে বিমলানন্দজী মায়ের কাছে একটি চিঠি লিখে বিষয়টি জানালে উত্তরে মা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ঠাকুর পূর্ণ অদ্বৈত ছিলেন, তাঁর সব ছেলেই অদ্বৈতবাদী। সেদিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক সাধনা, ভাবধারা এবং আধ্যাত্মিক সাধনপ্রবাহের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে সামান্য যে-সংশয় তৈরি হয়েছিল সাধকদের মধ্যে, মায়ের সিদ্ধান্তবাক্য সেটিকে নির্মূল করে দিল চিরকালের জন্য। এ নিয়ে আর কোথাও কোনওদিন কোনও সংশয় তৈরি হয়নি এবং হবেও না। তার কারণ মায়ের উক্ত বাক্য বেদবাক্যের মতো গৃহীত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শৈশবকালে একটি ঘটনায় বিপন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে মা রক্ষা করেছিলেন একটি বিচিত্র নির্দেশের মাধ্যমে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে তখন অনেকেই যোগদান করছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও কেউ কেউ যোগদান করছেন। ফলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ওপর পুলিশের খুব কড়া নজর ছিল। তৎকালীন ছোটলাট কারমাইকেল কিছু বিরূপ মন্তব্যও করেছিলেন। এসব একটি শিশু-সংগঠনের পক্ষে ছিল আতঙ্কের বিষয়। এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে সেকালের বরেণ্য সন্ন্যাসীদের। একসময় সঙ্ঘে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল যে, পূর্বে যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন এবং এখন সঙ্ঘে যোগদান করেছেন তাঁদের সঙ্ঘে রাখা হবে, কি না। মায়ের কাছে যখন এই আলোচনা এসে পৌঁছেছিল তখন মা স্পষ্টই শরৎ মহারাজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা ঠাকুরের নামে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দিতে হবে। এই নির্দেশের সঙ্গে তিনি যুক্ত করে দিয়েছিলেন, শরৎ মহারাজ যেন কারমাইকেলের সঙ্গে কথা বলে সব বুঝিয়ে বলেন। শরৎ মহারাজ সেই নির্দেশ মেনে ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তার ফলে সমস্যা ধীরে ধীরে মিটে গিয়েছিল। এটি কেবল প্রশাসনিক নির্দেশ নয়। পিছনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শৈশব অবস্থায় সঙ্ঘকে মাতৃশক্তি দিয়ে মা যেন ধারণ করে রাখলেন। তত্ত্বের দিক থেকেই হোক, আচরণের দিক থেকেই হোক, রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই হোক বা বাইরের কোনও আঘাতের কারণেই হোক, নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের—রামকৃষ্ণ-ভাবধারার অস্তিত্বে যাতে কোনওরকম বিভেদ তৈরি না হয় তা শ্রীশ্রীমা তাঁর মাতৃশক্তি দিয়ে সুনিশ্চিত করলেন। মাতৃমূর্তির এই অবস্থানটি আমাদের বিস্মিত করে।

## তিন

মাতৃমূর্তির পূর্বোক্ত তিনটি রূপই এসেছে সংশয় নামক অসুরকে হত্যা করবার জন্য। আলোচিত তিনটি বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত মাতৃরূপকে, সংশয়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে একত্রিত করে দেখলে বোঝা যাবে, মায়ের আবির্ভাব কোনওদিন প্রেমহীন হতে দেবে না সংসারকে। সংসারে যখনই মানুষ নিজেদের মধ্যে নানারকম বিবাদে প্রেমহীনতাকে অনুভব করবে, তখন যদি এই মাতৃমূর্তিকে স্মরণ করে তাহলে স্বতঃই বিবদমান মানুষের অন্তরে মায়ের দিব্য ভালবাসা পুনরাবির্ভূত হবে। দ্বিতীয়ত, যদি এই মাতৃরূপটিকে ধ্যান করা যায় তাহলে কোনওদিন মানুষ সংসারে দিশাহীন হবে না, কোনও বিক্ষিপ্ততা মানুষের মধ্যে কাজ করবে না। কারণ মা তো তেমনি একটি আশ্রয় যে-আশ্রয় সবকিছুকে বেঁধে রাখছে। মায়ের রূপের বা জীবনের অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে, বাণীর স্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে, মানুষের বিক্ষিপ্ত বা দিশাহীন জীবন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। কারণ মা একটি জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, চৈতন্যরূপ একটি মাতৃমূর্তি। এই মাতৃমূর্তি এসেছেনই ওই আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য। এর প্রভাবে মানুষ ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হতে থাকবে। যে-মানুষ মায়ের কাছে আসবে সে যখন ফিরে যাবে, আর আগের মানুষ থাকবে না। পদ্মবিনোদ নিজে দুরাচারী হতে পারেন, কিন্তু মায়ের কাছে এসে আস্তে আস্তে তাঁর মন পালটে যাচ্ছিল। তাই মৃত্যুর সময়ে তিনি ঠাকুরকে স্মরণ করতে পেরেছিলেন। মায়ের কাছে আসত এরকম একটি মানুষের রূপান্তরের ছবি অসামান্যভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর লেখা শ্রীমায়ের জীবনীতে। পূজনীয় মহারাজ জয়রামবাটীতে একটি দিনের একটি ঘটনার কথা লিখেছেন, আমজাদের সঙ্গে মায়ের একদিনের সাক্ষাতের কথা। আমজাদ অনেকদিন পরে মায়ের কাছে এসেছে। মহারাজ লিখছেন, সে মায়ের কাছে আসার আগে কয়েকদিন জেলে ছিল। যখন সে মায়ের বাড়িতে ঢুকছে তখন চুল উসকো-খুসকো, শরীর-কাপড়চোপড় ময়লা। মা তাকে তেল দিলেন,

খেতে দিলেন। তারপর মায়ের সঙ্গে আমজাদের অনেকক্ষণ কথা হল। কেউই জানল না, কী কথা হল। যখন সে মায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। গম্ভীরানন্দজী দেখিয়েছেন, যে-আমজাদ এসেছিল আর যে-আমজাদ চলে যাচ্ছে, দুজন এক নয়। এই ঘটনাটি পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়, আমজাদ যেভাবে মায়ের কাছে এসেছিল অবিন্যস্তভাবে—আসলে যেন একটি মানবসভ্যতা এসে হাজির হয়েছিল মাতৃমূর্তির কাছে। অত্যন্ত সাধারণ, আটপৌরে মাটি-নিকানো একটি ঘরে, একটি মাতৃমূর্তির কাছে এসেছে একটি অবিন্যস্ত, বিপন্ন মানবসভ্যতা, একটি মানুষের রূপ ধরে। তারপর কী কথা হল কেউ জানল না। কিন্তু যখন সে বেরিয়ে গেল তখন সেই সভ্যতার রূপটি বদলে গেছে, শরীর পালটে গেছে, মনটা পালটে গেছে। যে ডাকাত ছিল সে মানুষ হয়ে উঠেছে। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের, আধ্যাত্মিক শক্তির এটাই সবথেকে বড় অবদান এই পৃথিবীর কাছে। আধ্যাত্মিক শক্তি যখন আসে, যখন কাউকে ছোঁয়, কারও ভিতরে প্রবেশ করে, তখন যার ভিতরে প্রবেশ করল, যাকে স্পর্শ করল বা যার সান্নিধ্যে এল, তাকে পালটে দেয়।

হতে পারে এই পৃথিবীর মানবসভ্যতা একে অপরকে সন্দেহ করছে বা করবে, কলহ করছে বা করবে। কিন্তু একদিন না একদিন তাকে এই মাতৃমূর্তির চরণতলে আসতেই হবে, যে-মাতৃমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যে-মাতৃমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে আলাদা কিছু নয়, যে-মাতৃমূর্তির আধারে রয়েছে জগদ্‌ব্যাপী চৈতন্যশক্তি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী বলছেন সমাগত অসুরকে, ''একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'', অর্থাৎ ''জগতে আমিই আছি একা, দ্বিতীয় আর কোথায়?'' এই এক চৈতন্যশক্তিরূপে তিনি জগতে অনাদি, অনন্ত কাল থেকে বিরাজিত হয়ে আছেন। তিনি মহিষাসুরকে পরাজিত করেছিলেন ত্রিশূল দিয়ে। এযুগে মা ত্রিশূল নিয়ে বিরাজ করেননি। তাঁর অপূর্ব আধ্যাত্মিক চৈতন্যশক্তির স্নেহকোমল স্পর্শে, অপূর্ব আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তিনি এযুগে বিরাজ করছেন। জয়রামবাটীতে অনেকে প্রসাদ পেতে এসেছে। সবাই প্রসাদ পেয়ে উঠে গেলে মা এঁটো পরিষ্কার করছেন। বিভিন্ন জাতের মানুষ খেয়ে গেছে, মা বামুনের মেয়ে হয়ে সেই এঁটো স্পর্শ করছেন দেখে নলিনীদিদি আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন : ''মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!'' মায়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর : ''সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'' জগতকে আমরাই তো বিভিন্ন রূপে দেখি। এই মাতৃমূর্তি যখন জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন সেখানে কোনও ভিন্নতা থাকতে পারে না। অভিন্নতাতেই এর শুরু। ভারতের বিখ্যাত শাস্ত্রগ্রন্থ 'গৌড়পাদকারিকা'তে গৌড়পাদ সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন :

''তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্ত্বদারামঃ তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥''

অর্থাৎ এই যে-তত্ত্ব, জগতের মধ্যে যে-চৈতন্য বিরাজিত তাকে অন্তরে ও বাইরে সবকিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট দেখতে হবে। কেবল তাতেই একজন তত্ত্বীভূত হতে পারে। তাই কখনই তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। জগৎ জুড়ে এই যে-চৈতন্যশক্তি বিরাজমান তাকে অনুভব করলে কোনও সংশয়, কোনও দিশাহীনতা, কোনও কলহ বা বিভেদ থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। সেই মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা পেয়ে, তার স্নেহকোমল রূপ দিয়ে, ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে সবাইকে কাছে টানছে, একজায়গায় ধরে রাখছে। মায়ের কাছে এই প্রার্থনা, যেন তত্ত্বরূপী এই মাতৃমূর্তির সাধনা থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত না হই।